শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪৭

উপহার।

সূচিপত্র।

অপদেবতার হাট

ভূত ও কিম্ভূত

হাজারিবাগ জেলায় 'হাড্ডিছাতুয়া'র মাঠ। মাঠটির যেন শেষ নেই। তার এক ধারে দু'তিনটে বড় বড় পাহাড়, আর অন্য ধারে প্রকাণ্ড শালবন। মাঝখানে ধূ ধূ ক'রচে ঢেউ খেলানে "হাড্ডিছাতুয়া"র মাঠ।

শালবনে চিরদিন বাস করে এক পাল বেহারী ভূত। আর সেই পাহাড়গুলোয় ঘুরে বেড়ায় দলে দলে বিকট আকারের কিম্ভূত। বাংলাদেশের লোকেরা কিম্ভূতের কথা জানে না—কারণ এ দেশে কিম্ভূত নেই। আছে কেবল ভূত।

ভূতে আর কিম্ভূতে আকাশ পাতাল তফাৎ। ভূতগুলোর গায়ে চামড়া, মাংস, রস, রক্ত, নাড়ীভুঁড়ী কিছুই নেই। আছে কেবল হাড় আর পাঁজরা। কিন্তু কিম্ভূতগুলো

সে 'রকম নয়। তাদের গায়ে মাংস না থাকলেও, হাড়-পাঁজরগুলো চামড়া দিয়ে ঢাকা। তাদের খুব বড় বড় পেট, আর তাদের মুণ্ডুগুলো হাড়সার নয়—তাতে জিভ্‌ দাঁত, নাক, কাণ, চোখ, সবই আছে—তবে বেজায় বিৎভস রকমের। তাদের মাথায় আবার শুক্‌নো খড়ের মত খড়-খড়ে চুল।

আবার ভূতগুলো কখনো মরে না, কিন্তু কিম্ভূতেরা মরে—তবে অনেকদিন, অনেকদিন পরে। তাদের এক একটা বাঁচে দু'শো, তিনশো বছর। কিন্তু তারা ম'রে যে কি হয় তা কেউ ঠিক ব'লতে পারে না। কেউ কেউ বলে যে তারা ম'রে হয় "যমদূত"। কেউ বলে "তা নয়, ওরা ম'রে হয় লঙ্কার রাক্ষস। তখন তারা খায় কেবল লঙ্কা আর ছাতু—যেমন বেহারীরা খেয়ে থাকে।" কিন্তু শেষের লোকের কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

যা হোক, মোটের ওপর কিম্ভূতেরা বড় সোজা চিজ নয়। ভূতেদের মত তারাও হাওয়ায় মিশে থাকে। তখন তাদের দেখা যায় না। আবার ইচ্ছে ক'রলেই তারা দেহ ধ'রতে পারে। তারা যেম্নি বদ্‌রাগী, তেমনি রাক্ষুসে, আবার তেম্নি জোরালো। ভূতেরাও তাদের কাছে জারীজুরী ক'রতে ভয় পায়। এম্নি তারা দুর্দ্দান্ত।

একবার জঙ্গলের এই ভূতেদের সঙ্গে পাহাড়ী কিম্ভূতদের বাধলো ঝগড়া। ওঃ! সে কি ব্যাপার! কিছুদিন ধ'রে

"হাড়িছাতুয়া'র মাঠ কুরুক্ষেত্র হ'য়ে প'ড়লো। সেখানে যায় কার সাধ্যি? সেই ঝগড়ার কথাই ব'লচি, শোনো :—

কিম্ভূতদের একটা মেয়ে আছে তার নাম "গন্ধভূড়ভূড়ী"। মেয়েটা যেমন দেখতে ভয়ানক কদাকার, তেম্নি তার গায়ে দূর্গন্ধ। বাপ্‌রে! সে যদি এক জায়গায় বসে থাকে তো তার গায়ের গন্ধে চার ক্রোশের মধ্যে কোন জীবজন্তু থাকতে পারে না। তার ওপরে আবার কি বিদ্‌কুটে তার চেহারা দেখলে প্রাণ খাঁচা ছাড়া হয় আর কি!

এক বিঘৎ চওড়া থ্যাবড়া নাক—তার ফোঁসা ছুটোর মধ্যে বেড়াল ঢুকে যায়। চ'খের মণি ছুটো যেন ক্রিকেট বল—আবার তা উল্টে আছে। মুখের হাঁটা এক কাণ থেকে আর এক কাণ পর্য্যন্ত টানা। তার মধ্যে আবার মোষের শিংএর মত লম্বা লম্বা, বাঁকা বাঁকা দাঁত। আর কি প্রকাণ্ড নাদা তার পেট! যেন একটা ঢাকাই জালা। তার হাত, পা, আর গলা কিন্তু কাঠির মত সরু সরু— আহা! কি অপরূপ তার রূপ রে!

কিন্তু তাকে দেখেই একটা ভূতের মুণ্ডু ঘুরে গেল। হাজার হোক ভূত কিনা? তাই যেটা যত কুৎসিত, তার কাছে সেটা তত সুশ্রী। আর যত দূর্গন্ধ, তার কাছে তা তত সুগন্ধ—নইলে আর ভূত ব'লেচে কেন?

গন্ধভূড়ভূড়ীকে দেখে, আর তার গায়ের গন্ধ শুঁকে, ভূতটা ক্ষেপে উঠলো। তাকে সে বিয়ে ক'রবেই ক'রবে।

কিন্তু কিঁম্ভুতেরা ভূতের ঘরে মেয়ে দেবে কেন? তাই সে মনে মনে যুক্তি আঁটলে 'ভূড়ভূড়ীকে' চুরী ক'রে ধর আনবার জন্যে।

হাড়্ডিছাতুয়ার মাঠে একটা ইন্দারা আছে। একদিন 'গন্ধভূড়্ভূড়ী' একা একা সেখানে নাইচে, এমন সময়ে চারটে ভূত সেখানে হাজির। তারা গন্ধভূড়্ভূড়ীকে কাঁধে তুলে নিয়ে, দে ছুট্ তো দে ছুট্। তারা তাকে একেবারে শালবনে নিয়ে এসে, তাকে বন্দিনী ক'রে রাখলে। গন্ধভূড়ভূড়ী গুঁতোয় পড়ে রাজী হ'লেই, ভূতটা তাকে বিয়ে ক'রবে—এই হ'লো তাদের মতলব।

খবরটা কিন্তু কিম্ভূতদের কাছে পৌঁছুতে দেরী হ'লো না। তারা সবাই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠ্লো। "কি! ভূতেদের এত বড় আস্পর্দ্ধা? কিম্ভূতের মেয়েকে তারা চুরী ক'রে নিয়ে যায়? এত বাড়্ কিছুতেই সহ্য হবে না!" তারা সবাই মিলে একসঙ্গে "হুম্, হাম্, গুম্, গাম্, গোঁ গোঁ, ফ্যাং ফ্যাঁং"—নানারকম গর্জ্জন সুরু ক'রে দিলে। তারপর তারা লাফাতে লাফাতে, ডিগবাজী খেতে খেতে, আর রাগে হাত, পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চল্লো শালবনের ভূতেদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে। তাদের লাফালাফি আর দাপাদাপির ঠ্যালায় হাড়্ডিছাতুয়াঁর মাঠে হঠাৎ উঠ্লো ভয়ানক ঝড়।

ভূতেরা শালগাছের ওপর থেকে দেখলে যে আষাঢ়ে মেঘের মত মাঠ অন্ধকার ক'রে দলে দলে কিম্ভূতেরা

আসচে তাদের শালবনের দিকে। তাদের আর বুঝতে বিলম্ব হলো না, যে ব্যাপারটা কি। তাদের মধ্যেও তখন "সাজ, সাজ!" পড়ে গেল। তারাও তো বেহারী ভূত? তারাই বা কিসে কম? মাথার খুলীর ওপরে পগ্‌গড় জ'ড়িয়ে "মার্! মার্!" রব ক'রতে ক'রতে তারাও ছুট্‌লো কিম্ভূতদের দিকে। এরা হাঁকার ছাড়ে "হনুমানজি!" বলে, আর কিম্ভূতেরা চেঁচিয়ে বলে "রাবণজি মহারাজ"! দু'দলের হুঙ্কারে "হাড্ডি ছাতুয়া"র মাঠ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো।

তারপরেই যুদ্ধ—উঃ! সে কি ভয়ানক কাণ্ড! যেমন মারামারির শব্দ, তেম্নি চিৎকার—সারা মাঠের জীবজন্তুদের কাণে তালা ধ'রে গেল। তারা সব মাঠ ছেড়ে, পোঁ পোঁ করে ভয়ে ছুটে পালাতে সুরু ক'রলে। ভূত আর কিম্ভূতে লড়াই– সে কি সাধারণ ব্যাপার!

ভূতেরা তাদের লম্বা লম্বা হাড় বা'র করা ঠ্যাং তুলে কিম্ভূতদের নাদা নাদা পেটে মারে লাথি আর কিম্ভূতেরা ভূতগুলোর হাড়পাঁজরা দেয় মড়্‌মড়্ ক'রে ভেঙে। ভূতেরা কিম্ভূতদের জ'ড়িয়ে ধ'রে, তাদের ঘাড়ে লাগায় কামড়—আর কিম্ভূতেরা ভূতগুলোকে মাথার ওপর তুলে ধ'রে লাগায় মাটীতে আছাড়। ভূতেরা কিম্ভূতদের চুল ধ'রে তাদের হিড়্ হিড়্ ক'রে টানে—আর কিম্ভূতেরা ভূতদের ঠ্যাং ধ'রে তাদের মাথার ওপর ঘোরায়। দু'দলের কেউ কম নয়—তাই কেউ কার কাছে হার মানতে চায় না। এম্নি

ভাবে সারা রাত তাদের যুদ্ধ চ'লতে লাগলো সমান ভাবে। শেষে যেই রাত পোহালো আর যুদ্ধ গেল থেমে। দিনের আলোয় তো আর ভূতুড়ে ব্যাপার হ'তে পারে না? তাই সে দিনের মত যুদ্ধ থামিয়ে তারা যে যার আড্ডায় চ'লে গেল। দু'দলেরই সারাদিন কাটলো কেবল নানা যুক্তি আঁটতে।

তারপর সন্ধ্যা হ'তেই আবার দাঙ্গা। আবার তাদের দুই দলে মারামারি, কামড়াকামড়ি চ'ল্লো সারা রাত। কিন্তু এবারেও কোন দল, কোন দলকে হারাতে পারলে না।

এই ভাবে রাতের পর রাত যুদ্ধ চ'লতে লাগলো। দিন এলেই বিশ্রাম। আর রাত হ'লেই যুদ্ধ। তবু কিন্তু এ যুদ্ধের মীমাংসা কিছু হয় না। শেষে দুই দলই নগা বিরক্ত হ'য়ে উঠলো।

তখন তাদের মধ্যে একটা রফা হ'লো। ঠিক হ'লো যে তারা সবাই মিলে এ ভাবে যুদ্ধ ক'রবে না। এবারের লড়াই হবে "ডুয়েল্"। ভূতেদের ভিতর হ'তে একটা বাছা পালোয়ান আর কিম্ভূতদের দলের তেম্নি একজন লড়াই ক'রবে। তাতে যে দলের বীর জয়ী হবে, সেই দলেরই জীত। ভূত হারলে গন্ধভূড়ভূড়ীকে ফিরিয়ে দেবে। আর যদি কিম্ভূত হারে তা হলে ভূতের সঙ্গে হবে তার বিয়ে।

তখন দুই দল থেকে দুজন যোদ্ধা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। ভূত আর কিম্ভূতের দল রইলো তাদের ঘিরে।

ভূতটার নাম "চুলবুল পাঁড়ে" আর কিম্ভূতটার নাম "ঘট্‌ঘটিয়া।" ছু'জনেই যেমন ভীষণ কদাকার, তেম্নি তারা পালোয়ন। তারা কেউ হনুমানজির, আর কেউ রাবণজি মহারাজের নাম নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রলে।

উঃ! সে কি যুদ্ধ! হাড্ডিহাতুয়ার মাঠে ধূলো উড়ে গেল। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কেউ কাউকে হারাতে পারে না। ভূত আর কিম্ভূতের দল ব'সে ব'সে কেবল "কি হয়, কি হয়" ক'রতে লাগলো।

শেষে চুলবুল পাঁড়ে হাঁপিয়ে প'ড়লো। সে ভূত কি না? তাই তার গায়ে রস, রক্ত, মাংস কিছুই নেই। কেবল আছে হাড়। শুধ্‌ হাড়ে আর কত লড়া যায়? তাই তার দম্‌ ফুরিয়ে আসতে লাগলো। সুযোগ বুঝে "ঘট্‌ঘটিয়া" তাকে মাথার উপর তু'লে, দিলে সজোরে এক আছাড়। ব্যস্‌—চুল্‌বুল পাঁড়ের চুলবুলুনী ভেঙে গেল। হাড় গুঁড়িয়ে, আর ঠ্যাং ভেঙে যেতে, সে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

কিম্ভূতদের তখন কি লাফালাফি! কি হাততালী! গন্ধ-ভূড়ভুড়ীকে নিয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে তারা পাহাড়ে ফিরে গেল। সেই থেকে ভূতেরা প্রাণ গেলেও কিম্ভূতদের আর ঘাঁটাতে চায় না। তারা বুঝলে যে ভূতদের সবাই ভয় ক'রলেও, ভূতেদের ভয় দেখাবার মত কেউ যদি থাকে তো তারা কিম্ভূত।

"জবরল পাঁড়ে ও ঘটুঘটিয়া পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করিল।"

ঝন্‌ঝনিয়া ও ঢন্‌ঢনিয়া
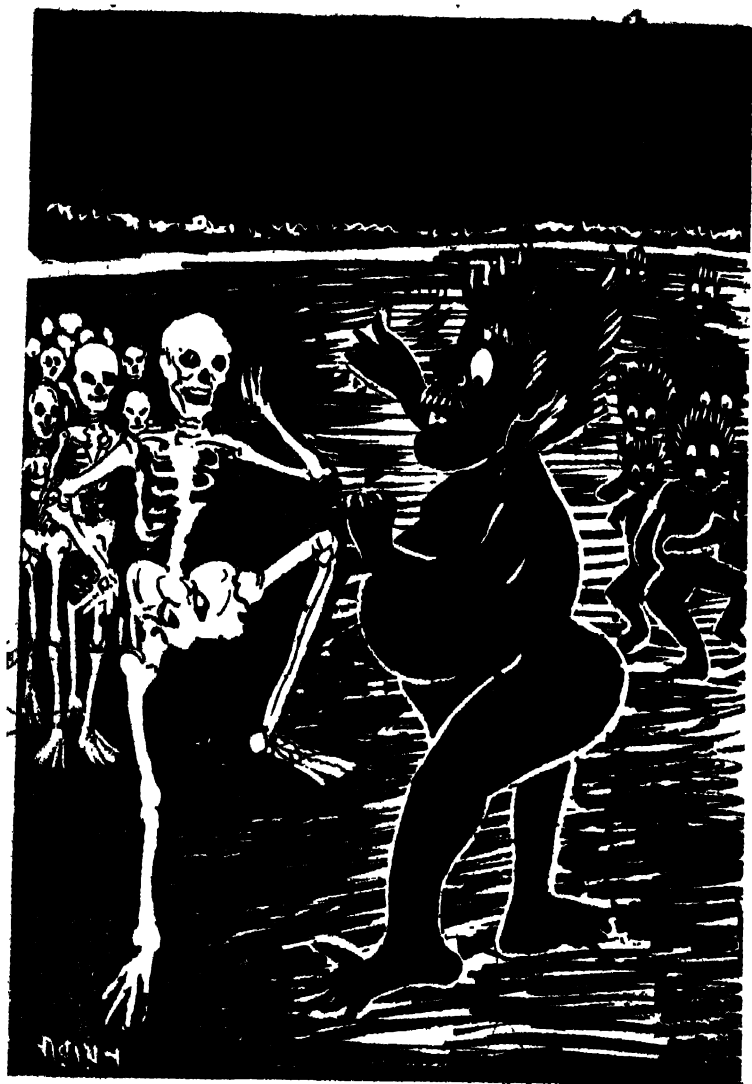
মুঙ্গেরের ভূমিকম্প সেদিনকার কথা। এমন ভূমিকম্প কেউ কখনো দেখিনি। সেদেশে ঘর, বাড়ী, একটাও আস্ত ছিল না। সব ভেঙে প'ড়ে স্তূপাকার। তাতে ঘর চাপা প'ড়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার লোক। তার মধ্যে কতক বাঁচলো, কতক ম'রলো। আবার কতকগুলো লোককে তো খুঁজেই পাওয়া গেল না। তারা আজও মাটীর তলায় প'চ্‌চে।

মাটী খুঁড়ে, যাদের পাওয়া গেল, তাদের হ'লো সৎকার। কাজেই তাদের গতি হ'য়ে গেল। যাদের পাওয়া গেল না, তাদের সৎকার হয় কি ক'রে? কাজেই গতি না হওয়াতে তারা হ'লো ভূত।

সহরের মাঝখানে একটা বড় বাড়ী ছিল। সেটা একজন বেহারী মহাজনের। তার নাম ছিল ঘণ্টারাম ঢন্‌ঢনিয়া। লোকটা তার ছেলে, মেয়ে, বউ, ঝি, সবাইকে নিয়ে একদম্‌ ঢুকে গিয়েছিল মাটীর তলায়। তাই তাদের কেউ বা'র ক'রতে পারেনি। ঢন্‌ঢনিয়া আর তার পরিবারের সবাই একসঙ্গে ম'রে ভূত হ'য়ে রইলো।

তার বাড়ীটা ছিল স্তূপাকার হয়ে। শেষে একজন মাড়োয়াড়ী সেই জমিটা কিনে, তার ওপরে বাড়ী তৈরী ক'রলে। মারোয়াড়ীটার নাম "রামরসাতল হনুমান দাস ঝনঝনিয়া।" ওদের দেশের নিয়ম হচ্ছে যে, ছেলের আর তার বাপের নাম পর পর ব'লতে হয়। তারপর পদবী। এর নিজের নাম রামরসাতল, বাপের নাম হনুমান দাস, আর পদবী হচ্চে ঝনঝনিয়া। তাই সব মিলিয়ে, এর নাম হ'লো "রাম-রসাতল হনুমান দাস ঝনঝনিয়া"।

ঝনঝনিয়া তার বাড়ীর সকলকে নিয়ে নতুন বাড়ীতে বাস করতে এল। এখানে যে ঢনঢনিয়ার দল ভূত হয়ে আছে, ঝনঝনিয়া তার কিছুই জানে না। কাজেই তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘর দোর গোছাতে লাগলো।

রাতে ঝনঝনিয়া অকাতরে ঘুমোচ্চে, হঠাৎ একটা কণকণে ঠাণ্ডা হাত তার গলা টিপে ধ'রলে। চ'মকে উঠে ঘুম ভেঙে যেতেই তার বোধ হ'লো যে কার যেন গরম নিঃশ্বাস তার মুখে এসে প'ড়চে। চোখ চেয়েই দেখলে "আরে রামজি! এযে একটা কঙ্কাল! মাংস কি চামড়া কিছুই নেই—কেবল কঙ্কাল।" সেটা তার বুকের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, একটা হাত তার গলায় দিয়ে রেখেচে আর তার মুখের কাছে মড়ার মাথাটা নিয়ে গিয়ে, মিট্ মিট্, মিট্ মিট্ ক'রে চাইচে। তার চোখে চোখ নেই, কেবল ছুটো গর্ত্ত। সেই গর্ত্তের ভিতরে কাঠের আঙরার মত কি যেন জ্ব'লচে।

ঝন্‌ঝনিয়া চীৎকার ক'রতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ভূতটা দাঁত খিঁচিয়ে ব'ল্লে—"চুপ। চেঁচালেই গলা টিপে মেরে ফেলবো। ...ল তুই কেন আমার বাড়ী দখল ক'রলি?"

ঝন্‌ঝনিয়া গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে ব'ল্লে—"এ্যাঁ, এ্যা, তোমার বাড়ী ? এই বাড়ী তো আমি করিয়েছি। তুমি কে ?

ভূত ব'ল্লে—"আমি ঘণ্টারাম ঢনঢনিয়া। এই ভিটে আমার। তুই কার কথায় এখানে বাড়ী তুল্লি ? ভাল চাস্ তো বাড়ী তুলে নিয়ে যা। নইলে ভাল হবে না।"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূতটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ঝন্‌ঝনিয়া তখন দর্ দর্ ক'রে ঘামচে। তারপর সে চেঁচাতে সুরু ক'রলে। তখন হুড়মুড় ক'রে বাড়ীর সব লোক সেই ঘরে এসে ঢুক্‌লো। ঝন্‌ঝনিয়ার মুখে সব কথা শুনে তারা তো অবাক। বাবা! এরকম ভূতের উপদ্রব হ'লে এ-বাড়ীতে বাস করা যাবে কি ক'রে ? পরের দিন সবাই মিলে নানা যুক্তি, পরামর্শ জুড়ে দিলে। শেষে তারা একদল গুণী লোককে নিয়ে এল ডেকে। তারা মন্ত্র প'ড়ে ঘর দোর সব বেঁধে দিলে, যাতে কোন ভূত ঘরে ঢুক্‌তে না পারে। তারপর তারা বাড়ীর সব লোককে কবচ, মাদুলী, শিকড় মাকড় পরিয়ে দিলে। তার ফলে ভূতেরা আর তাদের কাছে আস্‌তে পারবে না।

সেই থেকে ঘরের মধ্যে ভূত আর আসে না। কারও ওপর অত্যাচার ও ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু তবু বাড়ীর লোকেরা শান্তি পায় না। রাত্রে যখন তখন তারা দেখে জানালার পাশে কতকগুলো মড়ার মাথা উঁকি মারচে। তাদের সুমুখে আবছায়ার মত কারা যেন আসা যাওয়া ক'রচে। মাঝে মাঝে কাদের যেন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস শোনা যায়। দুপুর রাতে কে বা কারা

বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। আবার মাঝে মাঝে নানা রকম দুর্গন্ধে তাদের নাক যেন ঝাঁজিয়ে ওঠে। ঝনঝনিয়া মহা মুস্কিলে প'ড়ে গেল। কিন্তু তবু বাড়ী সে ছাড়ে কেমন ক'রে? এত টাকা খরচ ক'রে বাড়ী-তৈরী করিয়ে, কেউ কি তা সহজে ছেড়ে দেয়?

ক্রমে অত্যাচার আরও বাড়লো। ছাদের উপর কারা যেন লাফালাফি করে। উঠানে কারা যেন নাচে। রান্নাঘরের জিনিষপত্র নষ্ট ক'রে দেয়। মাঝে মাঝে মরা বেড়াল, পচা ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটী জানালা দিয়ে ঘরে এসে প'ড়তে থাকে। আর সে কি অট্টহাসি! "হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ" স্বরে তীক্ষ্ণ, লম্বা হাসি শুনে সবার শরীরের রক্ত যেন জল্ হ'য়ে আসে।

ঝনঝনিয়া তবু বাড়ী ছাড়তে চায় না। সে বরং ভূত তাড়াবার জন্যে আরও চেষ্টা ক'রতে লাগলো। রামযাত্রা, চণ্ডীপাঠ—এমন কত কি। ভাবলে ঢনঢনিয়ার দল এইবার জব্দ হ'য়ে "বাপ! বাপ!" ব'লে বাড়ী ছেড়ে পালাবে। যেখানে রামগান হয়, সেখানে কি ভূত থাকতে পারে?

কিন্তু ঢনঢনিয়া সে ভূত নয়। সে বরং আরও রেগে উঠলো। বল্লে—"বটে! দাঁড়াও। দেখি কে বাড়ী ছাড়ে—ঢনঢনিয়া না ঝনঝনিয়া?"

তারপর হঠাৎ আর একদিন রাতে হলো ভূমিকম্প। খ... সামান্য কম্প—আর কোন বাড়ীর লোক কম্প জানতেই

পারলে না। বোধ হয় তারা সকলেই খুব ঘুমুচ্ছিলো। কিন্তু ঝনঝনিয়ার নতুন বাড়ী হুড়মুড় করে ধ্বসে প'ড়লো। ঝন্‌ঝনিয়া তার বাড়ীর সব লোকের সঙ্গে একসঙ্গে বাড়ী চাপা পড়লো।

সেই থেকে সেটা ভগ্নস্তূপ হ'য়েই আছে। কেউ সেখানে সাহস করে বাড়ী করে না। অনেকে বলে যে রাতদুপুরে তারা নাকি ওই স্তূপের ওপরে দু'দল ভূতকে মারামারি কর্‌তে দেখেচে। তারা নিশ্চয় ঝনঝনিয়া আর টনটনিয়ার দল।
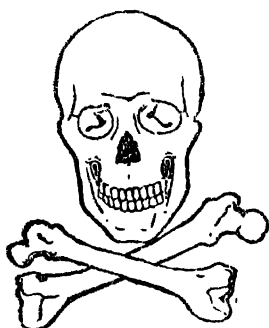
ডিগ্‌বাজি ভূত

কত রকমের ভূত যে আছে, শুনলে অবাক হতে হয়। ভাগলপুরের শ্মশানটা ঠিক গঙ্গার ধারে। সেখানে যে কত রকমের ভূত থাকে, তেমন আর কোথাও নেই। সেগুলোকে বলে ডিগবাজি ভূত। তাদের সবই আমাদের দেশী ভূতের মত। কিন্তু তারা হাঁটে মাথা দিয়ে। গাছের ডালে পা বাধিয়ে, মাথা নীচের দিকে ক'রে তারা ঝোলে—ঠিক যেন বাদুড়। চ'লতে হ'লে, তারা মাটীতে মাথা পেতে কেবল ডিগবাজি খেতে খেতে যায়।

একবার একটা লোক রাগের মাথায় একটা মানুষ মেরে ফেল্লে। ওর কাছে সে টাকা ধারতো। কিন্তু কিছুতেই দেয় না। আবার উল্টে তাকে দেয় গালাগালি। এই সে রাগের ঝোঁকে দিলে তার মাথায় এক লাঠি বসিয়ে, লোকটা তখনি গেল ম'রে।

মানুষ খুন—সে তো সোজা কথা নয়? এখুনি তাকে পুলিসে ধ'রবে। তার পর বিচারে হবে তার ফাঁসী। সে তাই রাতারাতি গ্রাম থেকে পালিয়ে গেল; কিন্তু কোথায় লুকোবে? ইংরেজের রাজ্য, যেখানেই যাক, ধরা পড়তে হবে। তাই ভেবে চিন্তে

সে লুকোলো গিয়ে সেই শ্মশানের জঙ্গলে। সেখানে একটা প্রকাণ্ড গাছে উঠে, তার ঘন পাতার আড়ালে সে লুকিয়ে ব'সে রইলো।

সেদিন পূর্ণিমা। তাই চারিদিক জ্যোৎস্নায় ফুট্ ফুট্ করচে। শ্মশান, মাঠ, গঙ্গার জল, গাছপালা, জঙ্গল বেশ দেখা যাচ্চে। লোকটা গাছের ডালে ব'সে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো যে কেউ তার খোঁজে আস্ছে কি না।

হটাৎ তার চ'খে পড়লো একটা কঙ্কাল। শ্মশান থেকে ডিগবাজি খেতে খেতে সেটা সেই গাছটার দিকে আস্চে। তার পিছনে একটা—আবার তার পিছনে আর একটা। ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে খেতে সন্ সন্ ক'রে তারা এগিয়ে আস্চে। লোকটা যেম্নি অবাক, তেম্নি ভয়ও হ'লো তার। "ওরে বাবা! এরা সব কারা রে! এ যে দেখছি কেবল হাড়! এরা এমন ডিগবাজি খেয়ে আস্চে কেন রে!" ভয়ে লোকটার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হ'য়ে এল।

তার পরেই তার কাণে এল "হি হি হি হি" হাসির শব্দ। চমকে উঠে সে চেয়ে দেখলে যে তার আশ-পাশের গাছগুলোর ডালে ডালে ঝুলচে অনেক কঙ্কাল। তাদের পা বেধে আছে ডালে আর মাথা ঝুলছে নীচে। তাদের সেই দাঁত বা'র করা মড়ার মাথা থেকে সেই রকম হাসির শব্দ উঠচে। দেখেই লোকটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। ভাবলে "ওরে বাবা! এ কোথায় এলুম রে? এর চেয়ে যে পুলিশের হাতে পড়া ভাল

"ওরে বাবা, এরা কারা রে! এরা এমন ডিগবাজি খেয়ে আস্‌ছে কেন!"

ছিল রে!” সে তখন মনে মনে “রামজি! রামজি!” জপ ক'রতে লাগলো।

তার পরেই কি আশ্চর্য্য কাণ্ড। কঙ্কালগুলো সেই রকম ঝুলতে ঝুলতেই এক ডাল থেকে আর এক ডালে, এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে আস্‌তে লাগলো। তারা একবার দোলে আর এক ডাল থেকে পা ছেড়ে দিয়ে আর এক ডালে বাধিয়ে দেয়। এম্নি ক'রে চারিদিক থেকে তারা সবাই আস্‌তে লাগলো তার দিকে। লোকটা তাই দেখে হয়ে গেল আড়ষ্ট, কাঠ। দেখতে দেখতে ভীষণ কাণ্ড হ'য়ে পড়লো। লোকটা ব'সে আছে, আর চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেল্লে কঙ্কালের দল। তার আশে পাশে, সুমুখে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, কেবলই সেই সব কঙ্কাল। উপরের ডালে পা বাধিয়ে, তার মুখের কাছে মুখ রেখে ঝুলতে ঝুলতে, তারা সব কট্‌মট্‌ ক'রে তার দিকে চাইতে লাগলো। তাদের সেই অন্ধকার চ'খের গর্ত্ত থেকে ঠিক্‌রে বেরুতে লাগলো যেন আগুনের কণা। তাদের সেই দৃষ্টিতে লোকটার সারাদেহ একবারে অসাড় হ'য়ে গেল। গাছের ডাল আঁকড়ে সে ব'সে রইলো যেন পাথরের প্রতিমূর্ত্তি।

ডিগবাজি ভূতেদের যে সর্দ্দার, তার মাথাটা তোলো হাড়ির মত প্রকাণ্ড। আর তার দাঁতগুলোও কি বিশ্রী! সে সেই লোকটার চ'খের সাম্‌নে তার আগুনের ভাঁটার মত চোখ রেখে দাঁত খিঁচিয়ে হেঁড়ে গলায় ব'ল্লে—

“কেন এলি রে! কেন এলি? এখানে কেন ম'রতে এলি?”

সঙ্গে চারিদিক থেকে সব কঙ্কালগুলো ব'লে উঠলো "কেন এলি? কেন এলি? হেথায় কেন ম'রতে এলি? হি হি হি হি হি হি—" সেই কথা শুনে লোকটার দুটো চোখ ঠেলে বেরুলো আর তার সারা গা ব'য়ে দর্‌ দর্‌ ক'রে ঝ'রে প'ড়তে লাগলো ঘাম। কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না।

পরক্ষণেই এক সঙ্গে অনেক জোড়া কঙ্কালের হাত তার দিকে এগিয়ে এল। তার গলায়, বুকে, পেটে, পায়ে, হাতে, কোমরে—সব জায়গায় লাগলো সেই কণকণে ঠাণ্ডা হাড়ের হাতের স্পর্শ। তার পর?

পরদিন সকালে একদল লোক সেই খুণকরা লোকটাকে শ্মশানে নিয়ে এল সৎকার ক'রতে। তারা দেখলে যে সেই খুণীটা শ্মশানের এক ধারে ম'রে প'ড়ে আছে, একদম্‌ কিম্ভূত কিমাকার হ'য়ে। তার মাথাটা কিন্তু রয়েচে নীচের দিকে আর পা দুটো র'য়েছে উপরে। ডিগবাজি ভূতেরা তাকে একেবারে ডিগবাজি খাইয়ে ছেড়েচে।

গুড় গুড়ে ভূত।

পাঞ্জাব অঞ্চলের মাঠে এক জাতের খুদে খুদে ভূত আছে। সেগুলো লম্বায় একহাত। ওই এক হাতের মধ্যেই তাদের ঠ্যাং ধড়, আর মাথা—কাজেই বোঝো তারা কি রকম খুদে ভূত।

ওই দেশের লোকেরা বলে যে ওরা ছিল ইংরেজ-শিশু। সিপাই বিদ্রোহের সময় নিষ্ঠুর 'নানা সাহেব' বিস্তর ইংরেজ শিশুকে মেরে ফেলেছিল। তারা কেউ ছ' মাসের, কেউ এক বৎসরের, কেউ বা বড় জোর দু' বৎসরের। তারাই ভূত হ'য়ে পাঞ্জাবের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকেরা ওদের বলে "গুড়গুড়ে ভূত।"

একবার একটা পাঞ্জাবীদের ছেলে বাড়ী থেকে রাগ করে বেরিয়েছিল। তার ইচ্ছে ছিল যে মাঠে মাঠে চ'লে, একবারে অনেক দূরের একটা সহরে পৌঁছুবে। তারপর সেখানে থেকে সে যাবে বোম্বাই সহরে। বোম্বাই সহরে তার এক মেসো থাকেন—সে তাঁর কাছেই গিয়ে থাকবে।

মাঠে মাঠে চ'লতে চ'লতে এক জায়গায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। তখন সে চারিদিকে চেয়ে দেখতে পেলে যে অনেক দূরে দু'তিনটে বুনোদের কুঁড়ে রয়েছে। সে সেইদিকেই চ'লতে লাগলো।

একটুখানি পরেই একটা মক্কার ক্ষেত। মক্কার গাছগুলো খুব ছোট ছোট বোধ হয় হাত খানেক ক'রে উঁচু হবে। সে দেখলে যে একপাল সাদা সাদা বেলের মত মাথা মক্কা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দৌড়ুলো। সে গুলোর হাত, পা, কি শরীরের আর কোন অংশ দেখা যায় না। কেবল মাথা—বোধ হ'লো যেন মাথা-গুলোই দল বেঁধে ছুটুচে।

ছেলেটা অবাক হ'য়ে গেল। তাইতো! এ আবার কি অদ্ভুত-জন্তু! এরা এক জাতের খরগোষ না তো? আচ্ছা দেখি, এদের দু একটা ধ'রতে পারি কিনা।

ছেলেটাও মক্কাক্ষেতে ঢুকলো। মাথাগুলো তখন চারিদিক থেকে লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্চে। সে গোটা কতক মাথার পিছনে তাড়া ক'রলে।

কাছাকাছি যেতেই সে ভয় পেয়ে থ'ম্‌কে দাঁড়ালো। ওরে বাবা! এ কি রে! এ গুলো তো জন্তু নয়; এ যে ভূত! এদের হাত, পা, পাঁজরা, সব কঙ্কাল। মাথাটা বেলের মত ছোট হ'লেও মড়ার মাথা। আবার মড়ার মাথায় কি রকম খিচোঁনো দাঁত? ছেলেটা তখন ভয় পেয়ে পিছনে হ'টতে লাগলো।

মাথাগুলো প্রথমে ছুটে পালাচ্ছিলো কিন্তু তাকে ভয় পেতে দেখেই, তারা ফিরে দাঁড়ালো। তারপর তাদের খুদে খুদে কঙ্কালের হাত মেলে, চারিদিক থেকে তারা তাকে ঘিরে ফেল্লে। তাদের কি হাসি? কি লাফালাফি! তারা সব দাঁত খিচিয়ে ছেলেটাকে উপহাস ক'রতে লাগলো। তাদের সকলেরই মুখে

এক কথা। সবাই সুর ক'রে ব'লচে—"ট্যা রা রা, ট্যা রা রা, ট্রীম্। বুলডগ জনশন্, পেট্ক্যাট্ জিম্।"

ছেলেটা মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেল। তাইতো! কি করা যায়! চারিদিকেই খুদে ভূত। তারা গান ক'রচে আর এগিয়ে আসচে। একটু পরে তারা হ'য়তো ঘাড়ে এসে প'ড়বে। তাইতো! কি করি? কোন দিক দিয়ে পালাই? দাঁড়িয়ে থাকলেও বিপদ। খুদে হ'লেও, ওরা ভূত। ঘাড়ে প'ড়ে যদি কামড়ায়? বাবা! ওই ছোট ছোট মড়ার মাথায় যে রকম খিঁচোনো দাঁত। সব কটাতে এক সঙ্গে কামড়ালেই হ'য়েচে আর কি! হতভম্ব হ'য়ে, সে সেখানে দাঁড়িয়ে নানা কথা মনে মনে তোলাপাড়া ক'ত্তে লাগলো।

গুড়গুড়ে ভূতেরা তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তারা হাত শিকলা শিক্লি ক'রে, একসঙ্গে পা তুলে তুলে নাচচে আর গাইচে—

"ট্যা রা রা, ট্যা রা রা, ট্রীম্। বুলডগ জন্সন্, পেট্ক্যাট জিম্॥" মাঝে মাঝে তারা আবার দাঁত খিঁচিয়ে একসঙ্গে "হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ" ক'রে হাসচে।

শেষে তাদের মধ্যে ছুটো ভূত শিকল থেকে হাত ছাড়িয়ে, তার ছ'পাশে এসে দাঁড়ালো—আর তাদের সেই কণক'ণে ঠাণ্ডা হাড়ের হাত দিয়ে তার ছুটো হাত ধ'রে ফেল্লে। ছেলেটা আঁৎকে উঠেই প্রাণ-ভয়ে মারলে একলাফ। একবারে গুড়গুড়েদের মাথা ডিঙিয়ে সে ও পাশে গিয়ে প'ড়লো। তারপর প্রাণপণে চিৎকার

"ট্যারারা, ট্যারারা টীম। বুলডগ জন্‌সন পেটক্যাট জিম্।"

ক'রতে ক'রতে ছুট্‌লো সেই বুনোদের কুঁড়ে লক্ষ্য ক'রে। ছুট্‌তে ছুটতে সে শুণলে যে তার পিছনে গুড়গুড়েরা গান ক'রচে "ট্যা রা রা, ট্যা রা রা, টীম্, । বুলডগ জন্‌সন্, পেটক্যাট জিম্ ॥"

সেই থেকে তার শিক্ষা হ'য়ে গেল। বাড়ী ছেড়ে একা একা মাঠের দিকে সে কিছুতেই যেতে চাইতো না। বাবা! একি অদ্ভূত গুড়গুড়ে ভূত!

ভূত ও রাক্ষসী

হায়দ্রাবাদের কাছে দণ্ডকারণ্য। এমন গভীর বন প্রায় দেখা যায় না। বিশ কি ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই—কেবল বন। বন আর পাহাড়। সে বনে মানুষ বড় একটা যেতে পারে না।

বনের মাঝখানে মস্ত একটা পাহাড়। তার একটা গুহার মধ্যে বাস করে এক অদ্ভুত রাক্ষসী। নিত্যি গোটা তিন চার জন্তু না হ'লে তার জলযোগ হয় না। কাজেই সে পাহাড়ে জীব জন্তু আর থাকে কি ক'রে? পাহাড়টা তাই নির্জ্জন—সেখানে জন্তু জানোয়ারের গোলমাল নেই।

একবার একটা লোক মানুষ খুন ক'রে, সেই বনে গেল পালিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে সে সেই পাহাড়টার কাছে এসে পড়লো। সে ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিল, তাই সেই পাহাড়ের একটা ছোট গুহায় শুয়ে সে ঘুমুতে লাগলো।

এদিকে রাক্ষসীটার নাকে গিয়েচে মানুষের গন্ধ। একেই তার তিন চার দিন খাওয়া হয় নি—তার উপরে মানুষের গায়ের মিষ্টি গন্ধ। রাক্ষসীটা আতিপাতি ক'রে তাকে খুঁজে বেড়াতে

লাগলো। শেষে সেই গুহার কাছে এসেই মানুষটাকে দেখতে পেলে। তার তখন কি আনন্দ! মানুষের মাংসের লোভে তার প্রকাণ্ড জিভ থেকে টপ টপ ক'রে জল পড়তে লাগলো।

লোকটার তখন ঘুম ভেঙে গিয়েচে। চোখ চেয়েই সে সেই ভয়ানক রাক্ষুসীকে দেখতে পেলে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত পা ভয়ে এমন অসাড় হ'য়ে গেল যে সে আর সেগুলো নাড়তেই পার্‌লে না। সেইভাবে শুয়ে শুয়েই সে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে সুরু ক'রলে। তার পরেই সে একটা বিকট চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

রাক্ষুসীটা তাকে ধরতে যাবে এমন সময় তার সে কাজে পড়লো বাধা। সেও যেন কেমন এক রকম ভ্যাবাচাকা হ'য়ে গেল। সে দেখলে, তার সুমুখে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত জীব। তেমন জীব সে আর কখনো দেখেনি। জীবটার গায়ে কোথাও মাংস, চামড়া কি চুল কিছুই নেই—কেবল আছে হাড়। সেটা তার দুটো হাড়ের হাত দিয়ে একটা প্রকাণ্ড পাথর তুলে,—তাকে মারবে ব'লে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটো শুধুই গর্ত্ত—কিন্তু তার মধ্যে আঙরার মত কি জ্বলচে। জীবটার দু'পাটী-দাঁত এখন খিঁচিয়ে আছে যে তা দেখে রাক্ষুসীটা অবাক হ'য়ে গেল।

কিন্তু হাজার হোক্, সে একটা রাক্ষসী মানুষের মত সামান্য জীবকে সে ভয় ক'রবে কেন? সে তাই ভীষণ রেগে, তাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়ালে। কিন্তু ওমা! এ কি? জীবটাকে তো ধরা গেল না? সেটা যেন হাওয়ার তৈরী। রাক্ষুসীটা তার স্পর্শ বুঝতে পারলে না।

পাথরটা কিন্তু ঠিক এসে প'ড়ল—তার মুখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে তার মূলোর মত দু'টো দাঁত ভেঙ্গে, তা থেকে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়েতে লাগলো। রাক্ষুসীটা ভীষণ যন্ত্রণায় এমন চিৎকার ক'রে উঠলো যে সেই শব্দে আশ পাশের গাছের পাতা গুলো আপনা আপনি প'লো ঝ'রে।

অদ্ভূত জীবটা তখনো তার সুমুখে দাঁড়িয়ে। সে তাই ভয়ানক রেগে সেটাকে ধরবার জন্যে চেষ্টা ক'রতে লাগলো। জীবটা এই তার সুমুখে, আবার এই তার ডাইনে, এই বাঁয়ে—অথচ সে কেবলই ম'রচে হাতড়ে। সে তাকে ধ'র্তে পারে না। কিন্তু জীবটা তাকে কেবলই মারচে দমাদ্দম ক'রে। শেষে রক্ষুসীটা ভয় পেয়ে, তার মুখের খাদ্য ফেলে লাগালে দৌড়। তখন মারের চোটে হাড় পাঁজোর চূর্ণ হ'য়ে এসেচে।

সেই অদৃশ্য জীবটা আর কেউ নয়—সেটা হ'চ্চে ভূত। সে এক যোগীর প্রেতাত্মা। যোগীটা ওই গুহাতেই যোগ সাধনা ক'রতো—সে অনেক কাল, অনেককাল আগে। তারপর একটা হিংস্র পশু তাকে মেরে ফেল্লে। সেই থেকে সে হ'য়ে আছে ভূত। ভূত হ'য়ে ওই গুহাতেই সে থাকে।

খুণে লোকটা তার গুহাতেই আশ্রয় নিয়েছিল। তাই সে হ'ল ভূতটার আশ্রিত—তার অতিথি। অতিথিকে রাক্ষুসীটা খাবে? তাই সে যুদ্ধ ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিলে। তারপর সে সেই লোকটাকে সাবধান করবার জন্যে, তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ডাকলে।

. ভূতের কণক'ণে ঠাণ্ডা হাত গায়ে লাগতেই লোকটার চৈতন্য ফিরে এল। চোখে চেয়েই সে দেখলে ভূত। আগে রাক্ষুসী দেখেই সে মূর্চ্ছা গিয়েছিল। এখন মূর্চ্ছা ভেঙেই দেখলে রাক্ষুসী নেই, কিন্তু তার বদলে আছে ভূত। দু'টার কোনটাই সুবিধের নয়। কাজেই আবার সে হাউ মাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো।

ভূত ব'ল্লে—"ভয় নেই। চুপ। এক্ষুনি এ বন থেকে পালাও। নইলে রাক্ষুসীর পেটে যেতে হবে। আমি ভূত হ'লেও যোগী। আমার দ্বারা তোমার অনিষ্ট হ'বে না। তুমি পালাও।"

লোকটার মুখে তখন কথা ফুটলো। বল্লে—"আপনি যোগী? তবে ভূত হ'লেন কেন?"

ভূত ব'ল্লে—"ভূত হ'য়েচি অপঘাতে ম'রে। আমাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছিল। এখন তুমি পালাও। তারপর ইচ্ছে হয় তো আমার একটা উপকার ক'রো। ক'রবে?"

লোকটা ব'ল্লে—"নিশ্চয় ক'রবো। কারণ, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েচেন। বলুন কি ক'রতে হবে।"

ভূত ব'ল্লে—"ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাসাগর। তার তীরে রামেশ্বর তীর্থ। সেখানে আমার পিণ্ড দিও। তাহ'লেই আমি উদ্ধার হ'য়ে যাবো। আমার নাম বেঙ্কট রাও।" এই নামে পিণ্ড দিও।"

লোকটা রাজী হ'তেই সে তাকে সঙ্গে করে বন পার করে দিয়ে এল। লোকটা ছদ্মবেশে গেল রামেশ্বর। সেখানে বেঙ্কট

রাও' এর পিণ্ডি দিলে। ভূতটাও উদ্ধার হ'য়ে গেল। লোকটা সেই থেকে হ'য়ে গেল এক সন্ন্যাসী।

রাক্ষুসীটীর হাড়গোড় চূর্ণ হ'য়ে গিয়াছিল ভূতের মার খেয়ে। সেটাও তাই আর বেশীদিন বাঁচলো না। ভূতটা মুক্ত হওয়ার পরই সে ম'রে গেল।

সেই থেকে দণ্ডকারণ্যে রাক্ষুসীর ভয় আর রইলো না।
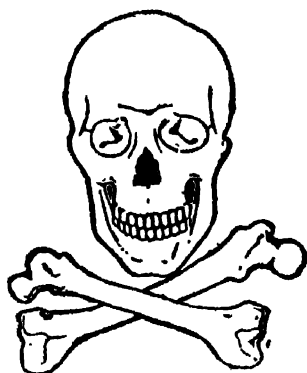
ছিঁচ্ কাঁদুনী পেত্নী

ডায়মণ্ড হারবারের কাছেই প্রকাণ্ড ক্যাওড়া বন। সেখানে নীচু স্যাঁতসেঁতে জমির ওপর কেবল ক্যাওড়া গাছ। সেই বনের ভিতর দিয়ে একটা খুবলম্বা আর সরু কাঠের পুল্ আছে গ্রামের এক অংশ থেকে আর এক অংশে যাওয়ার জন্যে। এক প্রান্তে বাজার আর অন্য প্রান্তে লোকালয়—এরই মধ্যে সেই ক্যাওড়া বন আর কাঠের পুল্।

অনেক বৎসর আগে সেই কাঠের পুলের নীচে বাস ক'রতো একটা পেত্নী। সেটা একা অদ্ভুত পেত্নী। লোকেরা তার নাম রেখেছিল ছিঁচকাঁদুনী।

সন্ধ্যের পর থেকে সারারাত তার কান্নার শব্দ শোনা যেত। পুল দিয়ে যেতে আসতে, একটু করে সবাই শুনতো যে পেত্নীটা কেবলই উঁ হুঁ হুঁ! উঁ হুঁ হুঁ! ক'রে কাঁদচে। কিন্তু তাকে দেখতেও পেতো না, আর ঠিক্ কোথায় ব'সে সে কাঁদচে তা কেউ বুঝতে পারতো না। লোকেরা তাই বিরক্ত হ'য়ে "ছিচকাঁদুনী পেত্নী" ব'লে তাকে ঠাট্টা ক'রতো।

মাঝে মাঝে এক একদিন রাত্রে সে বোধহয় গৃহস্থের আনাচে

কানাচে ঘুরে বেড়াতো। সে দিন সবাই শুনতো যে তাদের ঘরের ঠিক্ পিছনেই কে যেন "উঁ হুঁ হুঁ" ক'রে কাঁদ্‌চে। অনেকে কৌতুহলী হ'য়ে, আলো আর লাঠি-সোঁটা নিয়ে দৌড়ে যেতো কে কাঁদ্‌চে তাই দেখতে। কিন্তু কোথায় কে? শেষে তারা অবাক হ'য়ে যে যার ঘরে ফিরে আসতো।

ক্রমে পেত্নীটা বাড়াবাড়ি সুরু ক'রে দিলে। দিন দুপুরেও মাঝে মাঝে তার কান্না শোনা যায়। গৃহস্থদের নানা শুভ কাজের সময় তার সেই অলুক্ষুণে কান্নার রব ওঠে। কারও মেয়ের বিয়ে হচ্চে এমন সময় তাদের ঘরের পাশে পেত্নীটা কান্না জুড়ে দিলে। গৃহস্থেরা "দূর! দূর! অলুক্ষুণী, পোড়া-কপালী পেত্নী! দুর হ!" ব'লে তাকে গাল দিতে লাগলো। কারও ছেলের ভারী ব্যামো। যায় যায় অবস্থা। এমন সময় পেত্নীটা জুড়লে কান্না। সবার বুক ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো। তারা পেত্নীটাকে হাজার গাল পাড়তে লাগলো।

ক্রমে বোঝা গেল যে পেত্নীটার কান্না সত্যি সত্যিই অলুক্ষুণে। যে কাজে তার কান্না শোনা যায় সেই কাজেই অনর্থ ঘটে। তাই কোনো কাজে যাত্রা করবার সময় ছিচ্‌কাঁদুনীর কান্না শুনলেই লোকে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। নইলে সে কাজ নিস্ফল তো হয়ই—অধিকন্তু তাতে বিপদ এসে জোটে। লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো এই ছিচ্‌কাদুনীর জ্বালায়।

শেষে সবাই ভাবতে লাগলো কি ক'রে এই আপদটাকে বিদেয় করা যায়। কিন্তু সে তো মানুষ নয় যে মেরে তাড়াবে?

সে হ'লো পেত্নী। তার ওপর আবার কেউ তাকে দেখতেই পায় না। সে যে ঠিক্ কোথায় থাকে, তাও কেউ জানে না। তবে তাকে তাড়ানো যায় কি ক'রে? দেশের লোকেরা মহা ভাবনায় প'ড়ে গেল।

শেষে একটা পোদের ছেলে পণ ক'রলে যে সে সেই পেত্নী-টার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রবেই ক'রবে। কাউকে কিছু না ব'লে, একদিন দুপুর রাতে সে একটা টাঙী আর একটা দিয়াশলাই নিয়ে একা একা ঢুকলো সেই ক্যাওড়া বনের ভিতরে।

বেশ ঘন বন। এক এক হাত অন্তর সেখানে এক একটা ক্যাওড়া গাছ। আর তার তলা কি স্যাঁত-স্যেঁতে! তবে বেশ ফুটফুটে জোৎস্না ব'লে তার মধ্যে যেতে তার বিশেষ কষ্ট হ'লো না। সাহসে বুক বেঁধে সে সেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

একটু পরে পুলের নীচেই উঠলো ছিচ্কাঁদুনীর কান্নার স্বর।.. "উঁ হুঁ হুঁ! উঁ হুঁ হুঁ!" রব শুনেই প্রথমটা সে চ'মকে উঠলো। তারপর টাঙীটা বাগিয়ে ধ'রে ধীরে, ধীরে সে চ'ল্লো সেই পুলের দিকে।

পুলের কাছে গিয়েই সে দেখলে যে একটা আগাগোড়া সাদা কাপড় মুড়ী দেওয়া স্ত্রীলোক ব'সে আছে—তার কোলে একটা ছোট্ট শিশুর কঙ্কাল। শিশুটা বোধ হয় এক বৎসরের শিশু, কিন্তু এখন সে শুধুই কঙ্কাল। স্ত্রীলোকটি সেই কঙ্কাল কোলে ক'রে ব'সে কেবল "উঁ হুঁ হুঁ, উঁ হুঁ হুঁ স্বরে কাঁদচে।

পোদের ছেলেটা অবাক হ'য়ে গেল। তার তখন মনেই হ'লো না যে সেটা পেত্নী। সে তাই তার সুমুখে এগিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কে গা তুমি? এখানে ব'সে—"

আর ব'লতে হ'লো না। স্ত্রীলোকটা গায়ের আর মাথার কাপড় ফেলে হটাৎ তড়াং ক'রে উঠে দাঁড়ালো। বাপরে! কি বিভৎস তার মূর্ত্তি! কঙ্কাল! শুধুই কঙ্কাল! আবার সেই কঙ্কালের ছুটো চ'খের গর্ত্তের মধ্যে জ্বলচে ছুটো গণগ'ণে আগুণের আঙ্‌রা! পোদের ছেলটা—তাই দেখে ভয়ে একদম আড়ষ্ট, কাঠ হ'য়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে সুরু ক'রলে।

কঙ্কালটা তখন ভীষণ রেগে উঠচে। তার খিঁচোনো দাঁত আরও খিঁচিয়ে সে ব'লচে—"তা চিনবি কেন? আমি যে গরীব। তাই কেউ আমায় চিন্‌লে না। খেতে পেতুম না। রোগা ছেলে নিয়ে লোকের দোরে দোরে বেড়িয়েচি একটা পয়সার জন্যে। কেউ দিলে না। তাই পথ্য অভাবে এগারো মাসের ছেলে আমার কোলেই শুকিয়ে ম'রে গেল। অথচ সবাই তখন ছুধ, ঘী মাছ— কতকি খাচ্চে। আমোদ ক'রচে। আমিও ম'রছিলুম উপোস্ ক'রে। সাতদিন, সাতদিন অন্নজল পেটে যায় নি। তাই মরা ছেলে কোলে ক'রে আমিও ম'রে গেলুম। 'হাঃ, হাঃ, হাঃ,! আবার আমায় ব'লে ছিচ্‌কাঁছুনী। ছিচ্‌কঁছুনী সাধে হ'য়েচি—না?"

পোদের ছেলেটা কথা ক'ইবে কি; সে সেই পেত্নীটার ভীষণ

হাবভাব দেখে তখনও কাঁপচে। কথাগুলো সে শুনতে পেলে কি না—তাই বা—কে জানে।

এইবার পেত্নীটা আরও উগ্র হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্লে—"হাঃ, হাঃ, হাঃ! এখন আমার খোঁজ নিতে এসেচে।" ব'লচে "কে গা তুমি।" জ্যান্তে কেউ খোঁজ ক'রে নি। এখন ম'রেচি, তাই খোঁজ প'ড়ে গিয়েচে। আমি গরীব তাই অলুক্ষুণে। মর, তবে তুইও মর্। তুই মরে্ অলুক্ষুণে হ।" ব'লেই পেত্নীটা তার কঙ্কাল-ময় দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে ধ'রলে। সেও অম্নি চীৎকার ক'রে সেখানে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লো।

পরদিন সকালে যারা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারা সেই পুলের তলায় এসে দেখলে যে সেখানে সে ম'রে্ প'ড়ে আছে। তার জীভ্ বেরুণো আর তার মুখে ফেণা। আর তার চোখ দুটোও যেন ঠেলে বেরিয়ে আস্‌চে। ছিঁচ্‌কাঁদুনী তাকে মেরে তার দুঃখের প্রতিশোধ নিয়েচে। উঃ! কি ভীষণ ছিঁচ্‌কাঁদুনী পেত্নী।

কিন্তু সেই থেকে তার কান্না কেউ আর শুন্‌তে পায় না। পোদের ছেলের প্রাণের উপর দিয়েই সে তার মনের দুঃখু ঘুচিয়ে নিয়েচে।

ডাইনী বুড়ী

একদম্ থুড়্থুড়ে বুড়ী। তার চুল দেখে শণের নুড়ী বলে "আমি কাল আছি।" আবার তা যেম্নি রুক্ষ্ম, তেমনি ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া। বুড়ীর গালে নেই মাংস, মুখে নেই দাঁত, আর চোখ দুটো কোটরের ভিতর এম্নি ঢুকে গিয়েচে, যে তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না।

বুড়ীর দেহটা অস্থিচর্ম্মসার। তার হাত পা গুলো ডিগ্ ডিগ্ করচে, পাঁজোর গুলো সব গোনা যাচ্চে, আর কোমরটা এমন বেঁকে গিয়েচে যে বুড়ীর মথাটা এসেচে ঠিক্ হাঁটুর কাছে। একটা ছোট্ট লাঠিতে ভর্ দিয়ে বুড়ী তাই অতিকষ্টে চলে গুড়্গুড়্ ক'রে।

বুড়ীর আবার কি কালো রঙ! ঠিক্ যেন দাঁড় কাকের পাখা। তার বয়েস যে কত, তা কেউ জানে না। কেউ বলে একশো বছর, কেউ বালে দু'শো, কেউ বলে "ওটার মরণ নেই, তাই সে বেঁচে আছে চার যুগ।" বুড়ীটাকে কেউ মানুষ ব'লে স্বীকার করে না। সবাই বলে "ওটা ডাইনী। ভূত, পেত্নী শাঁকচুন্নী, এদের সকলেরই সর্দ্দার হ'চ্চে এই ডাইনী বুড়ী। মানুষের মত দেখতে হ'লে কি হবে? আসলে ও মানুষ নয়—

ছেলে মেয়েরা তাই বুড়ীকে দেখলেই, দূর থেকে লাগায় ছুট্। বউ ঝিরা "রাম রাম" ব'লতে থাকে। গ্রামের কোন লোক কোন

দিন তার কুঁড়ের কাছ দিয়ে হাঁটে না। কি জানি, ডাইনী বুড়ী যদি কারও মন্দ করে বসে?

বুড়ীটা থাকে গ্রামের বাহিরে, একটা জঙ্গলের ধারে। ছোট্ট একটি তাল পাতার কুঁড়ে—তার ভিতরেই সে চিরদিন বাস করে। তার আবার সখ কত? অনেক রকমের বিদ্‌কুটে জন্তু জানওয়ার সে পুষে রেখেচে। প্রথমেই তো দেখা যায় তার দোরের স্মুমুখে বাঁধা একটা কাল কুকুর, একটা বানর আর একটা বেঁজী। তা ছাড়া আবার একটা গোসাপ আর একটা পাহাড়ে ময়াল ও আছে। পাখীর মধ্যে দাঁড়কাক আর হুতোম পেঁচা—সে দুটো তার কুঁড়ের মধ্যেই থাকে। সব চেয়ে ভয়ানক হচ্চে গোটা কতক মড়ার মাথা। সেগুলো বুড়ীর ঘরের চারি পাশে ছড়ান আছে। এ সব দেখে শুনে, কারও কি সাহস হয় তার ঘরের কাছে যেতে?

একবার একটা বাগ্দীর ছেলের হ'লো দুর্ম্মতি। সে ভাবলে—"আচ্ছা, বুড়ীটা খায় কি? ওর পেট চলে কেমন ক'রে? ও বেটী ভিক্ষে-সিক্কেও করে না—যে তাই থেকে ও নিজে খাবে আর ওর পোষা জীবগুলোকে খাওয়াবে। তবে ও চালায় কি ক'রে?" সে ভাবলে যে বুড়ীটা নিশ্চয় যক্। ওর ঘরে অনেক টাকা পোঁতা আছে। টাকাগুলো চুরী ক'রতে পারলে তার দুঃখু ঘোচে। ডাইনী বুড়ী নির্ভাবনায় খাবে, আর সে পাবে কষ্ট? তা কিছুতেই হবে না। ওর টাকা গুলো চুরী ক'রতে হবে।

মনে মনে যুক্তি এঁটে, কাউকে কিছু না ব'লে, একদিন সে একাএকা চ'ল্লো সেই জঙ্গলের দিকে। বুড়ীর কুঁড়ের সামনেই একটা ছাতিম গাছ। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়ে সে সেই ছাতিম গাছটায় উঠে প'ড়লো। তারপর তার ঘন পাতার ভিতরে

লুকিয়ে ব'সে, সে দেখতে লাগলো বুড়ীটা কি ক'রে, আর কখন সে ঘুমোয়। তারপর সুযোগ বুঝলেই সে চুপি চুপি গাছ থেকে নেমে, বুড়ীর কুঁড়েতে ঢুকবে তার যকের ধন চুরী ক'রতে।

রাত ক্রমেই বাড়তে লাগলো। অন্ধকারও বাড়তে লাগলো সেই সঙ্গে সঙ্গে। ক্রমে রাত দুপুর এসে গেল। কিন্তু বুড়ী আর ঘুমোয় না। একটা কেরোসিনের টেমি জ্বেলে সে কেবলই খুট্ খাট্ ক'রচে। এটা নাড়চে, ওটা নাড়চে, ময়ালটার গায়ে হাত বুলোচ্চে, কুকুরটাকে কি খেতে দিচ্চে—এই রকম কত কি সে ক'রচে সারারাত। বেটী-শোয় ও না, ঘুমোয় ও না। বাগ্দীর ছেলেটা ভারী বিরক্ত হ'য়ে উঠ্লো। ভাবলে "দূর ছাই! গাছ থেকে নেমে গিয়ে মারি বুড়ীর মাথায় এক লাঠি। বুড়ী ম'রলে কার কি ক্ষতি? বরং ডাইনী বেটী ম'লেই গ্রামের মঙ্গল।"

এই রকম নানা কথা সে ভাবচে, এমন সময় সে দেখলে যে ডাইনী বুড়ী তার কুঁড়ের সুমুখে একটা উনোনে আগুন দিচ্চে। সে ভাবলে যে বুড়ীটা এইবার রেঁধে খাবে। তারপর শুতে যাবে। সে তাই চুপ ক'রে গাছে ব'সে তার অপেক্ষা ক'রতে লাগলো।

উনোন্ জ্বেলে, বুড়ীটা একটা তেলের কড়া এনে তাইতে চাপালে। তারপর বিড়্ বিড়্ ক'রে ব'ক্তে ব'ক্তে নানা রকম বিদ্কুটে জিনিষ সেই তেলে ছেড়ে ভাজতে লাগলো! কি আশ্চর্য্য! এ সব বিশ্রী; বিদ্কুটে জিনিষ সে ভাজে কেন? বাগ্দীর ছেলেটা অবাক হ'য়ে তাই দেখতে লাগলো।

বুড়ীটা প্রথমে তেলে ছাড়লে এক মুঠো তেলা পোকা। তারপর উচ্চিংড়ে, কেন্নো, চড়াই পাখী, টিকটিকী কচ্ছপের মাথা, বাছুড়ের ঠ্যাং, গুবরে পোকা, সজারুর কাঁটা, শুয়োরের দাঁত, ভাল্লুকের লোম, আর একটা ছোট্ট মড়ার মাথা। একরাশ শিকড়, লতা, পাতাও সে মন্তর প'ড়তে প'ড়তে সেই তেলে ছেড়ে দিলে। তারপর এক ঘটী কিসের দুধ এনে যেই সে তেলে ছাড়লে আর তেলটা সেই সঙ্গে সঙ্গে দপ্ ক'রে উঠ্‌লো জ্বলে। বুড়ী অম্নি তাড়াতাড়ি সেই তেলের কড়াটা সেইখানে উবুড় ক'রে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সে কি ধোঁয়ার সৃষ্টি! সেই খানকার মাটী থেকে কেবলই ধোঁয়া বেরুতে লাগলো, আর সেই ধোঁয়া জ'মে হ'তে লাগলো এক একটা প্রেতমূর্ত্তি। দেখতে দেখতে প্রায় দশ বারোটা কঙ্কাল মূর্ত্তি প্রেত-বুড়ীকে ঘিরে হিলিবিলি—হিলিবিলি ক'রতে সুরু ক'রলে।

বাগ্দীর ছেলেটার তখন কাঁপুনী ধ'রে গিয়েচে। সে ভাবচে "ওরে বাবা! এ বেটী কে রে! এ তো মানুষ নয়? এ যে সত্যি সত্যি ডাইনী! এমন জানলে কি এখানে আসি? এখন কি ক'রে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরবো রে? বুড়ী জানলেই যে গিয়েচি?"

গাছের ডালে ব'সে কাঁপতে কাঁপতে চোখ ভ্যাব্‌ভেবে ক'রে সে বুড়ীর কাণ্ড দেখতে লাগলো।

ভূতগুলো জমা হতেই, বুড়ী তাদের দিকে চেয়ে ব'ল্লে—

"মেঞ্চো, পেঞ্চো, ঘেঞ্চো!—ভট্টুল, জট্টুলে, কাল্‌কুঁড়ো! শ্মশান ঘাটের খবর কি রে? আজকে এল ক'টা?"

ভূতগুলো নাচতে লাগলো। নাচতে নাচতে উত্তর ক'রলে—"তিনকুড়ি বুড়ী! তিনকুড়ি। সবগুলো—তার গতি পেলে, বাকি কেবল তিনটে। তুই নম্বরের পাপী, তাই তিনটিই গেল—ধাপার জলায়।" ব'লেই তারা আবার নাচতে লাগলো।

বুড়ী আবার জিজ্ঞেস ক'রলে—"চামশুঁট্‌কী, আল্‌কাত্‌রী, কুৎকুতি? তোদের বিয়ে তো দিয়ে দিলুম। কিন্তু তোদের বোন? সেই হাড়চাটুণীটার বর কোথায় পাই? বর যোগাড় ক'রেচিস? বর?"

ভূতগুলোর মধ্যে তিনটে পেত্নীও ছিল। তারাই বোধহয় চামশুঁট্‌কী, আল্‌কাত্‌রী আর কুৎকুতি। তারা তিনটেতে এই বার নাচতে নাচতে উত্তর ক'রলে—"বর তো পেয়েচি বুড়ী? বেশ বর। ওই ছাতিম গাছেই সে ব'সে রয়েচে তোর মাথা ভাঙবে ব'লে। দিব্যবর—দেনা বুড়ী? ওইটিই দে হাড়চাটুণীকে। আহা! দিব্য বর? বেশ বর? "ব'লেই তারা ছাতিম গাছেব দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাতে দেখাতে নাচতে লাগলো।

বাগ্দীর ছেলে তাই শুনে বেজায় ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে—"যা! তবে তো সব জেনেচে? এইবার তা হ'লেই গিয়েচি?" ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে গাছ থেকে নেমে, পালাবার চেষ্টা ক'রতে গেল।

ঠিক্ সেই সময়ে বুড়ী ব'ল্লে—"জেলের পোলা, সিঁধেল

চোর। মিলবে ভাল রে! মিলবে—ভাল! জট্টুলে যা, ।ুলে যা, ফিরে না যায়, পথ আট্‌কা। হাড়চাটুণীর আজকে বিয়ে। মট্‌কিয়ে ঘাড় আসবি নিয়ে।"

অম্নি সঙ্গে সঙ্গে ভূতের পাল সেই ছাতিম গাছটা ঘিরে ফেল্লে। তারপরেই বাগ্দীর ছেলের দফা—শেষ। গ্রামের লোকেরা পরের দিন সেই জঙ্গলের ধারে তার মরা দেহ খুঁজে বা'র ক'রলে। তখন শিয়ালে তার অর্দ্ধেকটা খেয়ে নিয়েচে।
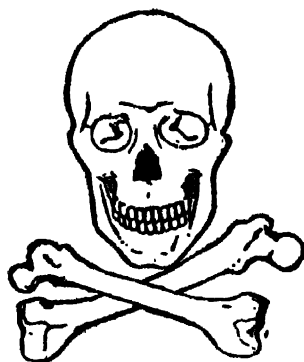
ভূতের প্রতিশোধ।

ভণ্ডুলে হাড়ীর চিরদিনের রাগ দ্বিজু ঠাকুরের ওপর। বামুন হ'য়ে সে কিনা গরীব হাড়ীর জমিটা নিলে ফাঁকীদিয়ে? সে তাই দিনরাত ভাবে কিসে সে বামুণকে জব্দ ক'রবে! কিন্তু সে গরীব, আর বামুনের অনেক পয়সা। তাই হাজার চেষ্টা ক'রেও সে তার কিছুই ক'রতে পা'রলে না। শেষে ভাবলে—"দাঁড়া বামুন! তোকে আমি ছাড়চি না। জ্যান্তে যখন তোর কিছু ক'রতে পারলুম না, তখন তোরই উঠোনে গলায় দড়ী দিয়ে ম'রবো। তা হ'লেই লোকে ভাববে যে তুই আমাকে মেরে ফেলেচিস্। তখন পুলিসে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তোকে ফাঁসীতে চড়িয়ে দেবে। দাঁড়া—এই যুক্তি ক'রেই তোকে জব্দ ক'রবো।"

যেমন ভাবা তেম্নি কাজ। একদিন অন্ধকার রাতে বামুণের উঠোনের একপাশে যে ঢেঁকীঘর ছিল, তারই আড়ায় সে গলায় দড়ী দিয়ে ঝুলতে লাগলো।

সকাল বেলা—তাই দেখেই বামুণের চক্ষুস্থির। সর্ব্বনাশ! ব্যাটা হাড়ী মরবার আর জায়গা পেলে না? এখন উপায়?" বামুন তো ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াতে লাগলো।

দেখতে দেখতে কথাটা ছ'ড়িয়ে প'ড়লো—গ্রামময়। দলে দলে স্ত্রী, পুরুষ আসতে লাগলো ভণ্ডুলেকে দেখতে। সবারই মনে সন্দেহ বামুণ তাকে মেরে, আড়ায় টাঙিয়ে দিয়েচে। নইলে এত জায়গা থাকতে সে এর ঢেঁকীঘরেই বা গলায় দড়ী দিতে আসবে কেন? তারা তখন পুলিসে খবর পাঠিয়ে দিলে। পুলিস এসেই সন্দেহ ক'রলে দ্বিজু ঠাকুরকে। তারা তখনি তাকে হাতে হাতকড়ি দিয়ে থানায় নিয়ে গেল।

তারপর বিচার। দ্বিজু ঠাকুর তার পক্ষে ভাল ভাল উকিল লাগালে। তারা সবাই মিলে দ্বিজু ঠাকুরকে বাঁচাবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। খুব ধূমধামের মামলা। দেশের লোক কি হয়, কি হয়" ক'রতে লাগলো।

এদিকে ভণ্ডুলে ম'রে ভূত হ'য়েচে। তখনো তার ভারী রাগ বামুনের ওপর। বিশেষ, যখন বামুনেরই জন্যে তাকে গলায় দড়ী দিয়ে ম'রতে হ'য়েচে, তখন তার ফাঁসী না দেখে সে ছাড়বে? তাই মকর্দ্দমার শেষ দিন—হাওয়ার মত অদৃশ্য হ'য়ে সেও চ'ল্লো আদালতে বামুণের বিচার দেখবে ব'লে। নিজে অদৃশ্য হ'য়ে সেও দাঁড়িয়ে রইলো—ঠিক সেই আসামী দ্বিজু ঠাকুরের কাছে।

এদিকে উকিলেরা ভয়ানক তর্ক লাগিয়াচে। তারা ব'লচে যে দ্বিজু ঠাকুরের সাজা কিছুতেই হ'তে পারে না। ভণ্ডুলে হাড়ী তার ঢেঁকী ঘরে গলায় দড়ী-দিয়ে ম'রেচে। দ্বিজু ঠাকুর যে তাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েচে, তার প্রমাণ কি? কেউ তো আর

তা স্বচক্ষে দেখে নি! তবে শুধু সন্দেহ ক'রে তাকে সাজা দেওয়া হ'বে কেন?

কঠিন যুক্তি। হাকিমেরও মন ট'লে গেল। তিনি ও ভাবতে লাগলেন "তাই তো! দ্বিজু ঠাকুর যে ওকে মেরে ফেলেচে, তার প্রমাণ কি? তা হ'লে প্রমাণ অভাবে ওকে তো ছেড়ে দিতে হয়। আচ্ছা এমন কি কেউ নেই যে স্বচক্ষে দেখেচে যে দ্বিজু ঠাকুর খুন করেচে ভণ্ডুলেকে?"

হটাৎ তাঁর চোখ প'ড়ে গেল আসামীর কাটগড়ার ওপর। দেখলেন আসামীর পাশে আবছায়ার মত কি দাঁড়িয়ে আছে। তার গলায় আবার দড়ি জড়ানো। তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—"ওকে! আসামীর কাছে ওটা দাঁড়িয়ে কে?"

সবাই সেই দিকে চেয়ে দেখলে—"তাই তো! এ আবার কোথা থেকে এল? আর এ লোকটাই বা কে?"

একজন সাক্ষি ব'ল্লে—"হুজুর! এই সেই ভণ্ডুলে হাড়ী। একেই তো দ্বিজু ঠাকুর—"

হাকিম ব'ল্লেন—"তাই নাকি? এ তাহ'লে প্রেতাত্মা? বেশ, বেশ, ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্ সত্য ঘটনাটা কি?"

তারপর তিনি ভণ্ডুলের প্রেতাতমার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন—"দেখচি তুমি সুবিচার চাইতে এসেচো। আচ্ছা বল দেখি তোমায় মারলে কে? তুমি নিজে ম'রেচো, না তোমাকে কেউ মেরেচে?"

ভণ্ডুলে তখন তার সেই আবছায়ার হাত দিয়ে দ্বিজু ঠাকুরকে দেখিয়ে দিলে।

সাবাই অবাক। কি আশ্চর্য্য! মরা মানুষ ভূত হ'য়ে এসেও তার হত্যাকারীকে সনাক্ত ক'রচে। এ তো তা হ'লে সত্য ঘটনা! এই দ্বিজু ঠাকুরই ওকে মেরে ফেলেচে।" হাকিম আবার জিজ্ঞাসা ক'রলো—"সত্য বল। এটা বিচারালয়। এই আসামীই কি তোমাকে মেরে ফেলে আড়ায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল?"

ভূতটা ঘাড়নেড়ে ব'ল্লে "হ্যাঁ।" তারপর হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা" ক'রে অট্টহাসি হেসে সে আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ সাক্ষ্যি অবিশ্বাস করা চলে না। সকলেরই স্থির বিশ্বাস হ'লো যে এই বামুণই খুনী। শেষে তার ফাঁসীর হুকুম হ'য়ে গেল।

তারপর অনেকদিন হ'য়ে গিয়েচে। আজ ও অনেকে মাঝে মাঝে দেখতে পায় যে দ্বিজু-ঠাকুরের উঠোনে দুটো ভূত মারামারি ক'রচে। তার একটা দ্বিজু ঠাকুর আর অন্যটা ভণ্ডুলে।

ভূতের উপকার।

বাগানের ধারেই একটা মহানিমের গাছ। অনেক দিন থেকে সেখানে একটা ভূত থাকে। ভূতটা খুব ঠাণ্ডা। কখনও সে কারও অনিষ্ট করে না। অনেকবার অনেকের চখে সে পড়েচে. কিন্তু তাদের ভয় পেতে দেখলেই সে সরে গিয়েছে। ভূতটা খুব ভদ্র ভূত নিশ্চয়।

একদিন রাতে একটা বউ এল সেই গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ম'রতে। তার স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, সবাই তাকে গঞ্জনা দেয়, আবার ধ'রে মারে—কারণ তার বাপ ভারী গরীব, তাই তত্ত্ব তাবাস ক'রতে পারে না। এবার সামনে দুর্গাপূজা। কিন্তু তার বাপ তত্ত্ব করে নি। তাই তারা বউটাকে ভারী কষ্ট দিয়েচে। মনের দুঃখে সে তাই এসেচে গলায় দড়ী দিয়ে ম'রতে।

গাছের ডালে দড়ি বেঁধে, তার ফাঁসটা গলায় পরাতে যাবে, এমন সময়ে ভূতটা বল্লে—"ছিঃ! অপঘাতে ম'লে যে পেত্নী হ'বি—তা জানিস্?" বউটা চ'মকে উঠ্‌লো। যা! কে যে দেখে ফেলেছে! তবেই তো বিষাদ! মরাও হবে না, আবার গঞ্জনাও শুন্‌তে হবে বেশী। কি সর্ব্বনাশ!" সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো কে তাকে এ কথা বল্লে।

ভূতটা বল্লে—“দেখচিস্ কি ? আমি মানুষ নই, ভূত। এই গাছেই আছি। আমিই তোকে মানা ক’রচি—এ কাজ করিস্ নি। পেত্নী হওয়ার কত কষ্ট তা জানি ? বউটা ভয় পেলে না। সে তো মরতেই এসেচে। ভূতে আর তার ক’রবে কি ? বরং কোন মানুষ যে জানতে পারে নি এই রক্ষে। সে তাই ভূতের কথার উত্তরে বল্লে—“তা বাঁচলেও জ্বালা ম’রলেও জ্বালা। তবে মরাই ভাল। বেঁচে থেকে কষ্ট সওয়া যে বড় কঠিন। সাধে কি আর ম’রতে এসেচি ?”

ভূত বল্লে—“কিসের জ্বালা ? তোর কষ্টটা কি তাই শুনি।” বউটা তখন কাঁদতে কাঁদতে তার দুঃখের কথা ব’ল্লে। শুনে ভূতটার দুঃখ হলো। সে বল্লে—“আচ্ছা, তুই মরিস নি। বাড়ী যা। এবার থেকে তোর উপর তারা যাতে অত্যাচার ক’রতে না পারে, তাই করবো। আমি ভূত। ইচ্ছা করলে আমি সব করতে পারি তা তো জানিস ? যা, বাড়ী যা।

বউটা কাঁদতে লাগলো। ব’ল্লে—“আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেচি। এতক্ষণ তারা খোঁজ, খোঁজ লাগিয়েচে। আমি বাড়ী গেলেই যে রক্ষে থাকবে না — তার কি ?”

ভূত বল্লে—“কুচ পরোয়া নেই। আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি। কেউ অত্যেচার করতে আসে তো তার ঘাড় ভেঙ্গে দেব। চল্, আমি তোর পিছনে আছি—ভয় কি ?”

ভূতের কথায় বিশ্বাস করে বউটা তখন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চ’ল্লো। বউটা বলেছিল ঠিক। তাদের বাড়ীতে সবাই

মহা হৈ চৈ বাধিয়েছে। কেউ বকাবকি করচে, কেউ গাল পাড়চে, কেউ বা শাসাচ্চে তাকে পেলেই গলাটিপে মেরে ফেলবে। তারা সব চারিদিকে খোঁজাখুজিও লাগিয়েচে খুব। এমন সময়ে বউটা বাড়ীর উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। এই আর যায় কোথায়? তাকে দেখেই সবাই রাগে গর্জ্জন করে উঠলো। তার শ্বাশুরী একটা আঁসবঁটী নিয়ে বল্লে—"তবে রে হারামজাদি! মরবার জায়গা জুট্‌লো না। তাই আবার এসেচিস্ জ্বালাতে? এই আঁস্‌বঁটী দিয়ে তোর গলা না কাটি তো আমার নাম স্বশীলা দেবী নয়।" তার শ্বশুরও ব'লতে লাগলো—"দূর কর্! দূর কর্! এ পাপ আবার বাড়ী এসেচে? মেরে তাড়া।"

বউটার স্বামী তখন একটা লাঠি নিয়ে তাকে তেড়ে মারতে এল। তার শ্বাশুড়ীও ছেলের সঙ্গে সঙ্গে বঁটী নিয়ে এলো কাটতে।

কিন্তু উঠোনে নেমেই তাদের ছুজনের চোখ কপালে উঠে গেল। রাগের ভাব চ'লে গিয়ে তখন তাদের চ'খে আর মুখে ফুটে উঠেচে দারুণ ভয়। "ওরে বাবা! ওর পেছনে দাঁত মুখ খিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা কি রে! উঃ! কি ভীষণ মূর্ত্তি! ওর চ'খের গর্ত্ত থেকে যে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্চে রে!"

শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ তো কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই পড়লেন অজ্ঞান হ'য়ে, আর স্বামীটা হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে ছুটে একটা তক্তপোষের তলায় ঢুকে প'ড়লো। বউএর শ্বশুর তাদের রোয়াকের উপরে ব'সে প'ড়ে "রাম রাম রাম রাম?" ব'লে কাঁপতে স্নুরু ক'রলে।

বউটার মন ভারী খুসী। সে গম্ভীর ভাবে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর ঘরের দোর বন্ধ করে মজাসে লাগালে ঘুম। সে রাতে আর তাকে কেউ কিছু বলতে সাহস করলে না।

পরদিন সে ঘর থেকে বেরুতেই তার শাশুড়ী বল্লে—"তুমি যাও বাছা! এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না। রাত দুপুরে ভূত সঙ্গে নিয়ে যে বেড়ায়, সে বেটী পেত্নী। পেত্নী বউ আমি ঘরে রাখবো না।"

বউ ব'ল্লে—"তবে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? এখন পেত্নী বল্লেই বা যাচ্ছে কে? আমার স্বামীর ভিটে। আমি এখান থেকে যাবো না।"

"কি ? যাবি না ? তোর জোর ?"

"হ্যাঁ, জোর। কিসের জন্যে যাব ? আমার দোষ কি ? আপনারাই দোষী। তাই গরীবের মেয়ে বলে আমায় গঞ্জনা দেন !"

"বটে ! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ? ওরে গোপাল ! ডাইনীটার মুখ শিলে ঘ'ষে দে তো। এত বড় কথা ! দে, বেটীকে মেরে তাড়িয়ে দে।"

গোপাল হলো বউটার স্বামী। যেমন মা তার তেমনি ছেলে। সেও রাগে চীৎকার করে বউটাকে মারতে গেল।

কিন্তু কি ভয়ানক কাণ্ড ! তখনি দুটো কঙ্কালময় হাত তাকে ধ'রে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সেও সেখানে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ভূতটা তখন শাশুড়ীর সুমুখে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়ালো। বল্লে—"খবরদার ফের যদি তোরা কেউ এর সঙ্গে ঝগড়া ক'রবি, তাহ'লে তোদের সব ক'জনের ঘাড় মট্ মট্ করে ভেঙ্গে দেব। জানিস ? এই বউটি আমার মা। এর উপর অত্যেচার ক'রলে তোদের ভাল হবে না—সাবধান !"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভূতটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সেই থেকে কেউ আর বউটিকে গঞ্জনা করতে সাহস করতো না। ভূতের সাহায্য পেয়ে বউটি আবার সুখে সংসার করতে লাগলো।

ভূতেদের পুরস্কার।

গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাবা মারা গেলেন আশী বচ্ছর বয়সে। খুব ঘটা ক'রে তাঁর শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল। গোবিন্দের কিন্তু তাতেও তৃপ্তি হ'লো না। সে ঠিক ক'রলে যে এক বৎসর পরে বাপের বাৎসরিক সপিণ্ডকরণ সেরে, সে গয়ায় যাবে তাঁর পিণ্ড দিতে। তা হ'লেই আর কোন দোষ থাকবে না। তার বাবা ড্যাং ড্যাং ক'রে স্বর্গে চ'লে যাবেন।

দেখতে দেখতে বৎসর কেটে গেল। গোবিন্দ শাস্ত্রমত সপিণ্ড-করণ শেষ ক'রলে। তারপর পাঁজি নিয়ে ব'সে গেল গয়ায় যাওয়ার দিন ঠিক ক'রতে।

আগামী পরশু খুব ভাল দিন। সেই দিনই যাত্রা করা হবে। সে তার গোছ গাছ সুরু ক'রে দিলে। সারা গ্রামে প্রচার হ'য়ে গেল যে আগামী পরশু গোবিন্দ গাঙ্গুলী গয়ায় যাবে বাপের পিণ্ডি দিতে।

সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে গোবিন্দ বাহিরের দাওয়ায় ব'সে তামাক খাচ্চে এমন সময় তার বোধ হ'লো যে একজন স্ত্রী-লোক আগাগোড়া সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে তার একপাশে এসে

দাঁড়িয়েচে। হুঁকো থেকে মুখ না তুলেই সে জিজ্ঞেস্ ক'রলে—"কে গা—?"

স্ত্রীলোকটা উত্তর ক'রলে—"বাবা ঠাকুর! আমি পঞ্চা ঘোষের মা। আমার নাম সৌরভী।" গোবিন্দ চ'মকে উঠ্‌লো। সেই সাদা কাপড় ঢাকা মূর্ত্তিটার দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে সে ব'ল্লে—"সে কি পঞ্চার মা যে অনেক বৎসর হ'লো মারা গিয়াচে! তুমি কি—"

হাঁা বাবা ঠাকুর! আমি পেত্নী। ম'রে আমার গতি হয় নি। তাই সেই থেকে পেত্নী হ'য়ে আছি।"

"এঁ্যা! ওরে বাবা!" ব'লেই গোবিন্দ এক রকম আঁৎকে উঠ্‌লো। স্ত্রীলোকটি ব'ল্লে—"ভয় কি? আমি তো তোমার অনিষ্ট ক'রতে আসিনি? তবে এমন ভয় পাচ্চো কেন বাবা ঠাকুর?"

"এঁ্যা! ভয় পাবো না? পেত্নী? পেত্নী! তা, তা, এখানে কেন বাবা?" স্ত্রীলোকটা ব'ল্লে—"এসেচি তোমাকে একটা কথা ব'লতে। তুমি তো পরশু গয়ায় যাচ্চো? তা, আমার একটা পিণ্ডি দিয়ে এসো। বড্ড কষ্ট পাচ্চি—বুঝলে বাবা ঠাকুর?"

গোবিন্দ ব'ল্লে—"আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি এখন স'রে পড়। আমি তোমার পিণ্ডি দিয়ে আসবো। এখন যাও বাছা! আমার বড় ভয় ক'রচে।"

স্ত্রীলোকটা ব'ল্লে—"আচ্ছা যাচ্চি। কিন্তু দেখো বাবা ঠাকুর! ভুলো না। তা হ'লে কিন্তু—"

"না, না, দেব দেব—সত্যি বলছি—" আর ব'লতে হ'লো না।

তখনি—অদৃশ্য হ'য়ে গেল। গোবিন্দ ও কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীর ভিতরে পালিয়ে এল।

পরেরদিন ভর্ সন্ধ্যাবেলায় গোবিন্দ ঘাটে গিয়েচে মুখ হাত ধুতে। কাজ শেষ ক'রে সে উঠ্তে যাবে, আর দেখলে একবারে আট দশটা কাপড় মুড়ি দেওয়া মূর্ত্তি তার পথ আগ্লে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই সে হতভম্ব হ'য়ে গেল। কথা কইবে কি? তার তখন অন্তরে অন্তরে কাঁপুনী ধ'রে গিয়েচে। শেষে এক রকম গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে সে ব'ল্লে—"কে? কে তোমরা? তোমরা কি—"

"হ্যাঁ ঠাকুর মশাই। আমরা প্রেত।" একটা মূর্ত্তি উত্তর ক'রলে।

"এ্যাঁ? প্রে-ত? রা-ম, রা-ম—"গোবিন্দ রীতি মত কাঁপতে সুরু ক'রে দিলে।

তাকে কাঁপিতে দেখে প্রেতগুলো—এক সঙ্গে "হি হি" ক'রে হেসে উঠ্লো। গোবিন্দ তখন যায় যায়। তার তখন অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়ার মত অবস্থা।

তাকে বেজায় ভয় পেয়ে একটা ভূত নরম স্বরে ব'ল্লে—

"ভয় ক'রচো কেন ঠাকুর দা? আমরা তোমাকে ভয় দেখাতে আসিনি। যে জন্যে এসেচি, শোনো—। কাল তুমি গয়ায় যাবে তো?"

গোবিন্দ কাঁপতে কাঁপতে উত্তর ক'রলে—"এ্যাঁ? হ্যাঁ—যাবো। কিন্তু—"

"কিন্তু টিন্তু চ'লবে না—ঠাকুর দা। আমাদেরও, পিণ্ডি তোমায় দিয়ে আসতে হবে সৌরভীর গতি ক'রবে, আর আমরা থাকবো ভূত হ,য়ে? তা হবে না। আমাদের ও গতি তোমায় ক'রতে হবে! নইলে জানো আমরা ভূত! তোমার বাড়ীশুদ্ধ সকলের ঘাড় মট্‌কে রেখে যাবো। বলো, পিণ্ডি দেবে?"

গোবিন্দ গ্যাঙাতে লাগলো। ব'ল্লে—"তা, তা, তোমাদের নাম আর গোত্র তো চাই? আর আমি এত টাকা কোথায় পাবো?"

"তাই বলো। টাকার জন্যে ভাবনা কি? সকালে উঠে তোমার দোরের সুমুখেই এক ধামা টাকা পাবে। আর আমাদের সকলের নাম আর গোত্র একটা কাগজে লিখে, সেই ধামায় রেখে যাবো। কিন্তু সাবধান! টাকা নিয়ে পিণ্ডি না দিলে, তোমায় আর বাঁচতে হবে না। বুঝেচো?" ব'লে ভূতগুলো—আবার এক সঙ্গে 'হি হি' ক'রে হেসে উঠলো।

গোবিন্দ তখন একটু সামলে নিয়েচে। সে ব'ল্লে—"আচ্ছা, পিণ্ডি দেব। এখন দোহাই তোমাদের—পথ ছেড়ে দাও। আমার শরীর কেমন কেমন করচে। আমায় ছেড়ে দাও?"

কথা শেষ করেই সে দেখলে যে ভূতেরা আর নেই। সে তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সে কথা সে বাড়ীর কাউকে কিছুমাত্র বল্লে না। কি জানি যদি তারা ভয় পায়?

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসতেই সে দেখ্‌লে সত্যি

সত্যি এক ধামা টাকা। সেই সঙ্গে একটা কাগজে দশ জন লোকের নাম আর তাদের গোত্র লেখা। তারা সবাই সেই গাঁয়ের লোক—তবে তারা ম'রে গিয়েচে অনেক দিন আগে। তার মধ্যে বামুন, কায়েৎ, গয়লা, কামার, কুমোর, নাপতে—সব জাতই আছে। কাগজ খানা যত্ন ক'রে সে পকেটে রেখে দিল। তারপর টাকাগুলো নিয়ে সিন্দুকে পুরলো।

সেই দিনই সে গয়া পথে যাত্রা ক'রলে। সেখানে পৌছে আগে সে নিজের কাজ শেষ ক'রলে। তারপর সৌরভী আর সেই সব ভূত গুলোর পিণ্ডি দিলে। তিন দিন পরে বাড়ী—ফিরে সে দেখলে আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভূতেরা আরও তিন ধামা টাকা এনে তার ঘরে রেখে গিয়েচে। সে যে তাদের গতি ক'রে এসেচে, এ হ'লো—তার পুরস্কার।

যক্ষ ভূত।

নিমাই তেলী টাকার কুমীর। মহাজনী কারবার ক'রে বিস্তর টাকা সে জমিয়েচে। কিন্তু সে ছিল মহাকৃপণ—তাই তা থেকে একটা টাকাও সে নিজের ভোগের জন্যে ব্যয় করে নি। সে তার সব টাকা একটা ছোট্ট জালায় ভ'রে, বেশ ক'রে তার মুখটা বন্ধ ক'রলে। তারপর তার ঘরের মেঝেয় সেই জালাটা ফেল্লে পুঁতে। দেশে যে চোর ডাকাতের ভয়। কোন দিন কে এসে সব লুটে নিয়ে যাবে! তাই সে এই রকমভাবে সাবধান হ'য়ে রইলো।

কিন্তু চোর ডাকাতের গ্রাস থেকে টাকাই নয় আটকালে! কিন্তু মরণকে তো চিরদিন কেউ আটকে রাখতে পারে না! তাই একদিন টাকার তাগাদা ক'রতে গিয়ে, খাতকের কুড়ুলের কোপেই নিমাই তেলী পটল তুল্লে। লোকটা ছিল বেজায় রাগী, আর নিমাইও তাকে গাল দিয়েছিল খুব—তাই সে হঠাৎ রেগে, তার হাতের কুড়ুলের এক কোপেই মহাজনকে সাবাড় ক'রে ফেল্লে।

একে অপঘাতে মরণ, তায় আবার মাটীতে টাকা পুঁতে, তাতে 'যক্' দিয়েচে—তাই তার গতি হলো না। ম'রে সে হলো একটা "যক্" বা যক্ষ। তারপর সেই দশায় সে তার ঘরের মধ্যে মেঝের নীচে যকের ধন পাহারা দিতে লাগলো।

স্যাঁতসেঁতে মাটীর নীচে, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে, কেচো, উই, পিঁপ্‌ড়ে আর নানা রকম পোকা মাকড় সহ্য ক'রতে ক'রতে, তার কষ্টের আর শেষ রইলো না। কিন্তু কি ক'রবে? সেখান থেকে নড়বার তো উপায় নেই? যক হ'লে সেই যকের ধনের উপরেই মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে থাক্‌তে হয়। সাধে কি বলে যে মাটীতে টাকা পোঁতা দোষের?

এম্নিভাবে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগলো। নিমাই তেলীর বাড়ীটা প'ড়ো বাড়ী হ'য়ে ক্রমেই বনে জঙ্গলে ভ'রে উঠ্‌লো। শেষে ঘরগুলোও ভেঙে, ধ্ব'শে স্তূপাকার হ'য়ে গেল। সেই জঙ্গলে, সাপ, ছুঁচো, ইঁদুর, শিয়াল বাস ক'রতে লাগলো। তার সব রইলো উপরে, আর দশ হাত মাটীর নীচে রইলো—যক্ নিমাই। কৃপণ, আর তার ঘর বাড়ী, টাকা কড়ির পরিণাম এম্নি ভয়ানকই হ'য়ে থাকে।

বিশ বচ্ছর পরে সেই জমিটা কিনলে একজন কলু। বন জঙ্গল কেটে, পরিস্কার ক'রে সেখানে বাড়ী তৈরী ক'রলে। তার-পর ঘানি বসাবার জন্যে মাটী খুঁড়তে সুরু ক'রে দিলে। খানিকটা খুঁড়তেই জালাটা ঠঙ্ ক'রে তাদের কোদালে ঠেকে গেল। তারা তখন আরও খুঁড়ে জালাটা তুলে ফেল্লে। তাতে এক জালা

টাকা। কলুটা তো মহা আনন্দে ড্যাং ড্যাং ক'রে নাচতে সুরু ক'রলে?

এদিকে যক্ নিমাই তেলীর ধরে গিয়েচে ছট্‌ফটানী। তার যকের ধন, তার যথাসর্ব্বস্ব পরে নিয়ে নিলে একি সে সহ্য ক'রতে পারে! তাই সে "হায় হায়" ক'রে মাথা চাপ্‌ড়াতে লাগলো। কিন্তু তার 'যক্' ফুরিয়ে গেল কিনা! তাই সে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হ'য়ে আবার বাইরে আসতে পারলো এখন আর মাটীর নীচে সে থাক্‌তে পারে না। পৃথিবীর উপরে প্রেত-মূর্ত্তি ধ'রে "হায় হায়" ক'রে বেড়াতে হয়। ভূত হ'য়েও তার শান্তি নেই। এখনও তার টাকার মায়া, টাকার শোক। তাই সে কেবলই বুক চাপ্‌ড়ায় আর গাছে মাথা—কোটে। আর সে কেবলই ভাবে কি ক'রে সে টাকা চোর কলুটাকে জব্দ ক'রবে। সে তাই সারা-রাত কলুর ঘানি গাছের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।
একদিন কলুর ঘাণি ঘুরচে, আর তার একটা আট বছরের ছেলে ঘাণি গাছের উপরে ব'সে গরু তাড়াচ্চে, এমন সময়ে নিমাইতেলীর প্রেতমূর্ত্তি সেখানে এসে হাজির। এদিক ওদিক চেয়ে সে দেখলে যে কেউ কোথাও নেই। সে তখন মট্ করে ছেলেটার ঘাড় ভেঙ্গে ফেল্লে।

কলু আর তার স্ত্রী যখন তাদের ছেলের এই দশা দেখলে তখন তারা কেঁদেই অস্থির। "হায়, হায়! কে এমন করলে! এইটুকু বালকের ঘাড়টা এমন করে ভেঙ্গে দিয়ে কে? এমন নিষ্ঠুর প্রাণ কার! সে কি মানুষ! না ভূত?" সন্দেহ করে

তারা একজন গণৎকারকে নিয়ে এল এই বিষয়টা গুণে বার ক'রতে।

মাটিতে খড়ি পেতে নানা রকম চক্র, ত্রিভুজ, চতুস্কোণ ইত্যাদি এঁকে অনেক গোণাগুণির পর গণৎকার ভাড়েরাম পাঁড়ে ব'ল্লে —"এ বাপু ভূতের কাজ। তোমার এই ঘাণি ঘরে ভূত আছে! সে তোমার ছেলের ঘাড় ভেঙ্গেচে।"

কলু জিজ্ঞেস ক'রলে —"তো হলে উপায়? ভূতটাকে কি করে তাড়ানো যায়।"

গণৎকার বল্লে —"সে কথা আমি জানি না। তুমি একজন ওঝা নিয়ে এস। সে যদি কিছু করতে পারে। আমি গণৎকার—ভূত তাড়ানো আমার কাজ নয়।"

পরদিনই ওঝা নিয়ে আসা হলো। ওঝার চেহারা দেখলে ভূত বলে আমি পদে আছি যেম্নি বুড়ো, তেম্নি রোগা, তেম্নি কাল, আবার তেমনি কদাকার। কিন্তু তার ভাড়ী নাম ডাক। সে নাকি ভূতের পাকা ওস্তাদ। তার নাম গিধেধাড় লাল।

ওঝা প্রথমে ঘাণির বন্ধন করলে। তারপর তার মেঝেয় বসে মন্তর প'ড়তে লাগলো। কলুটা তার সুমুখেই ব'সে। হঠাৎ কলুটা অজ্ঞান হয়ে পড়লো। সে কেবল গোঁ গোঁ করে, আর তার মুখ দিয়ে বেরোয় ফেণা। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত পা রীতিমত টানতে সুরু ক'রলে।

তারপর গিধেধেড় লাল তার গায়ে জলে ছিটে দিতেই সে

ঠাণ্ডা হ'লো। তখন ওঝা তাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলো আর সে দিতে লাগলো—তার উত্তর!

ওঝা বল্লে—"তুই কে?"

উত্তর—"আমি নিমাই তেলী।"

প্রশ্ন—"এখানে আছিস কেন?"

উত্তর—"এ যে আমার ভিটে। কলু বেটা এখানে এল কিসের জন্য।"

প্রশ্ন—"তুই এর ছেলের ঘাড় ভেঙ্গেচিস্?"

উত্তর—"হ্যাঁ।"

প্রশ্ন—"কেন?"

উত্তর—"কেন? বেটা কলু আমার ভিটে দখল ক'রলে, আবার এক জালা যকের ধন নিলে তুলে? ওকে আমি সহজে ছাড়বো। হায় হায়! আমার এক জালা টাকা!

প্রশ্ন—"এখন এ বাড়ী ছাড়বি?"

উত্তর—"না। কেন ছাড়বো? এ আমার ভিটে। আর আমার টাকা ও নিয়েচে। আমি কিছুতেই এ বাড়ী ছেড়ে যাব না।"

প্রশ্ন—"যদি তোর উপকার করি?"

উত্তর—"কি উপকার?"

প্রশ্ন—"গয়ায় তোর পিণ্ডি দেব। তা'হলেই উদ্ধার হ'য়ে যাবি। ভূত হয়ে থেকে, কি কষ্ট তা তো বুঝিস্? তার চেয়ে গতি হলে ভাল হয় না?"

উত্তর—"তা হয়। কিন্তু ও কি গতি করে দেবে?

প্রশ্ন—"হ্যাঁ দেবে। কিন্তু তার আগে আর কোন অত্যাচার করবি না তো?

উত্তর—"না। কিন্তু পিণ্ডি না দিলে ওর সর্ব্বনাশ করবো। আচ্ছা এখন চ'ল্লাম সাত দিন সময়—এই সাত দিনের মধ্যে পিণ্ডি দেওয়া চাই কিন্তু!"

ভূতটা চ'লে যেতেই কলু আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লো। ওঝাকে সে এক খুঁচি টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রলে। তারপর গয়ায় গিয়ে দিয়ে এল নিমাই তেলীর পিণ্ডি।

সেই থেকে নিমাই তেলীর প্রেত দশা ঘুচে গেল। কলুর আর কোন বিপদ হ'লো না।